PAPER CUTTING July 2023

সম্পাদকীয় আনন্দবাজার পত্রিকা

WBCS Bengali Compulsory Paper

9000+ WBCS aspirants

জুড়ে আছে আমাদের সঙ্গে ।

WHATSAPP - 8537872204

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Hospitals অধিক ওষুধে

তৃতীয় স্থানে ভারত। কোনও উন্নয়নের নিরিখে নয়, ‘হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড অ্যান্টিবায়োটিক রেসিসট্যান্ট ইনফেকশন’ (সংক্ষেপে ‘হারি’)-এর সাপেক্ষে। ৯৯টি দেশে পরিচালিত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, ভারতে প্রতি বছর প্রায় নব্বই লক্ষ মানুষ হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে থাকাকালীন নানান ব্যাক্টিরিয়াজনিত সংক্রমণের শিকার হন। তথ্যটি উদ্বেগজনক। প্রসঙ্গত, এই ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ব্যাক্টিরিয়ার সংক্রমণে, যাদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক জীবাণুগুলিকে সুপারবাগ বলা হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথম সারির অ্যান্টিবায়োটিক কোনও কাজ করে না। সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সারি কিংবা সর্বোচ্চ মাত্রার অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হয়, যেগুলি শুধু দামিই নয়, অনেক সময় মানবশরীরের পক্ষে রীতিমতো ক্ষতিকারক। এ দেশে উচ্চতর সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতাল কিংবা নার্সিং হোম এই ধরনের সংক্রমণের আঁতুড়ঘর। আরও উদ্বেগের যে, ভারতে এখনও এই ধরনের মারাত্মক সংক্রমণ নির্ণয়ের কোনও উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। যদিও এই সমস্যা শুধু ভারত নয়, গোটা বিশ্বের।

হাসপাতালে বিবিধ ভাবে এমন সংক্রমণ ছড়াতে পারে। রোগীকে ক্যাথিটার লাগানোর ফলে, ওষুধ প্রয়োগের জন্য শরীরে নল ঢোকানোর কারণে, অস্ত্রোপচারের পরে কিংবা ভেন্টিলেশনে রাখলে এই সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ে। বহু ক্ষেত্রে চিকিৎসা সরঞ্জামগুলির জীবাণুমুক্তিকরণে ত্রুটি, আবার কোনও সময়ে রোগীর চাপে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নতিস্বীকারের ফলে রোখা যায় না সংক্রমণ। তবে সমস্যা শুধুমাত্র হাসপাতালেরই নয়, গাফিলতি রয়েছে জনসাধারণের তরফেও। গত বছরের সেপ্টেম্বরেই *ল্যানসেট*-এর এক সমীক্ষায় জানা গিয়েছিল, ভারতীয়দের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার প্রবণতা অত্যধিক। অতিমারি পর্বে যা আরও ঊর্ধ্বগামী হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ মতো নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অ্যান্টিবায়োটিক না খাওয়া বা অকারণ ও অত্যধিক অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার ফলে শরীরে উপস্থিত ব্যাক্টিরিয়া ওই ওষুধের সঙ্গে লড়াইয়ের ক্ষমতা অর্জন করে ফেলে। এর ফলে, আগামী দিনে এই ধরনের ‘সুপারবাগ’-গুলির সঙ্গে লড়াই করার মতো প্রয়োজনীয় ওষুধ পাওয়া যাবে না বলেও আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের। সমস্যা হল, অ্যান্টিবায়োটিকের উপরে রাশ টানার বিষয়টি এ দেশে নতুন নয়। কিন্তু বিনা প্রেসক্রিপশনে অ্যান্টিবায়োটিকের সহজলভ্যতা ইন্ধন জুগিয়েছে এই প্রবণতায়। আজও এক শ্রেণির চিকিৎসক অপ্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের উপরেই ভরসা করেন।

আগামী দিনে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণে ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হবে এ দেশের জনস্বাস্থ্য। ফলে, সতর্ক হতে হবে চিকিৎসক, জনগণ— উভয়কেই। অসুস্থ হলে নিজের চিকিৎসা নিজেই করার নির্বুদ্ধিতা না দেখিয়ে, রোগীকে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, অসুখ সারানোর দায়িত্ব চিকিৎসকের। একই সঙ্গে সংক্রমণ রোধে হাসপাতালগুলিকে জানতে হবে কী ধরনের জীবাণু সংক্রমণ ছড়াচ্ছে, কত জন রোগী তাতে আক্রান্ত হয়েছেন, কী ভাবে নিরাময় সম্ভব। নিয়মিত এই ধরনের সংক্রমণের হার বা মৃত্যুর তথ্য জনসমক্ষে আনতে হবে। সচেতনতাই বাঁচার পথ।

Primary Education আনন্দপাঠ

বিদ্যালয়ের লেখাপড়াকে সত্যিই আনন্দপাঠ করে তোলা গেলে তত দুশ্চিন্তা থাকত না। সে জন্য গোড়ার যে কাজটা হওয়া দরকার তা হল নিয়ম করে ক্লাস হওয়া, ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা। তার বদলে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি দেখল, কোভিড কেড়ে নিয়েছে লেখাপড়ার দু'-দুটো বছর, শিশুদের পড়ার অভ্যাসটাই 'অতীত'। গত বছর ফেব্রুয়ারিতে স্কুল খোলার পর ফুটে উঠেছিল করুণ বাস্তব: একে তো বহু ছেলেমেয়ে স্কুলছুট, আর যারা আসছে, তারাও পুরনো পড়া গিয়েছে ভুলে— অঙ্ক করতে পারছে না, চেনা পাঠ্যবই থেকে পড়তে দিলেও হোঁচট খাচ্ছে, সহজ সাধারণ শব্দ দিয়ে বাক্য গঠনেও সমস্যা হচ্ছে তাদের। তার পর এক বছর গড়িয়ে গেছে, এ বছর প্রচণ্ড গরমে গ্রীষ্মাবকাশ হয়েছে দীর্ঘতর, দেড় মাস পর স্কুলে এসে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের সঙ্কট কাটেনি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের উদ্যোগে সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও সরকার-পোষিত প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শুরু হয়েছে 'পঠন উৎসব'— শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে।

উৎসব বললেই পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে ইদানীং যত না আনন্দ তারও বেশি শঙ্কা ঘনায়, দরকারি কাজগুলি ভুলে থেকে বা মানুষকে তা ভুলিয়ে রেখে ছুটি আর আনন্দ-ফুর্তিতে সরকারের আগ্রহ যে শঙ্কার কারণ। দেড় মাস লম্বা গরমের ছুটির পর প্রাথমিক স্কুলে হঠাৎ 'পঠন উৎসব'-এর আয়োজনেও একই শঙ্কার কারণ ছিল, তবে এখনও পর্যন্ত স্কুলে স্কুলে ছবিটি ইতিবাচক: নানা রকম 'বর্ণ কার্ড', চার্ট, মডেল ইত্যাদি তৈরি করে শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় খামতি বোঝার চেষ্টা করছেন, বহুবিধ বিকল্প পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের যাচাই করছেন কিন্তু শিশুদের তা 'পরীক্ষা' বলে মনে হচ্ছে না, তারাও সোৎসাহে উত্তর দিচ্ছে বা প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে। এই সবই আশা জোগায়, কারণ প্রাথমিক শিক্ষা আগাগোড়া এমনই হওয়ার ছিল। আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে শিশুদের স্কুলে আসা নিশ্চিত করাটা যদি গোড়ার কথা হয়, তার পরের গুরুত্বপূর্ণ কাজই হল প্রাথমিক স্তর থেকে পড়াশোনাকে আনন্দপাঠ করে তোলা, স্রেফ মিড-ডে মিল পাওয়ার ক্ষেত্র নয়। শিক্ষকেরা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আন্তরিক ভাবে কথা বলছেন, ছুটিতে তারা কে কী করেছে বা করেনি তা শুনছেন মন দিয়ে, 'উৎসব'-এর আবহে বুঝে নিচ্ছেন কোন পড়ুয়া কতটা পিছিয়ে আছে, ফলাফল বিশ্লেষণ করে পরবর্তী পদক্ষেপ করছেন— এই সব কিছুই আসলে হওয়া দরকার বছরভর। পঠন উৎসবে যদি সেই কাজের শুভারম্ভ হয় তবে তা স্বাগত।

একই সঙ্গে মনে রাখা দরকার, কোভিডের পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষাকে ধাক্কা দিয়েছে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিরাট দুর্নীতি। মনে রাখা দরকার, গত দশ বছরে রাজ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে সাত হাজারেরও বেশি প্রাথমিক স্কুল; জানা দরকার, শিক্ষার অধিকার অনুযায়ী প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত অনুপাত ১:৩০, এ রাজ্যে যা ১:৭৩। সর্বোপরি, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষৎ, রাজ্য শিক্ষা দফতর ও সরকারের বোঝা দরকার, ধাক্কাটা অতিমারি, দাবদাহেরই হোক বা দুর্নীতির, সুদূরপ্রসারী ক্ষতি হয় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের; বনিয়াদি স্তরে পড়াশোনা না হলে মুছে যায় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তাই পঠন উৎসব সহায়েই হোক বা রোজকার রুটিনেই, ফেরানো দরকার সারবস্তুটি— প্রাথমিকে পড়াশোনার সংস্কৃতি।

Mosquito Borne Diseases পুনরাবৃত্তি?

ঘনঘোর বর্ষা নিয়ে অধুনা পশ্চিমবঙ্গবাসীর মনে কাব্যভাব কমই জন্ম নেয়। বর্ষা মানেই জল জমা, বিপর্যস্ত নিকাশি। এবং বর্ষা মানেই মশাবাহিত রোগ। বস্তুত, গত বছর ডেঙ্গি নিয়ে শহর কলকাতা এবং সংলগ্ন অঞ্চলে যেমন আতঙ্ক ছড়িয়েছিল, তেমনটির নজির খুব বেশি পাওয়া যায় না। আক্রান্তের সংখ্যা তো বটেই, রেকর্ড গড়েছিল মৃতের সংখ্যাও। এই বছর তার পুনরাবৃত্তি আটকাতে অন্তত খাতায়-কলমে তৎপর প্রশাসন। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম যেমন নগরপালকে লেখা চিঠিতে থানার সামনে রাখা পরিত্যক্ত গাড়িগুলি দ্রুত সরিয়ে ফেলতে অনুরোধ করেছেন। ডেঙ্গির জীবাণুবাহক মশার বংশবিস্তারের পছন্দসই ক্ষেত্রগুলির মধ্যে পরিত্যক্ত গাড়ি এবং টায়ার অন্যতম। সুতরাং, আঁতুড়ঘরগুলিকে ধ্বংস করা হলে তার বংশবিস্তারের কাজটি ব্যাহত হবে। সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়াকে নিয়ন্ত্রণ করাও সহজ হবে।

অবশ্য, গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত মার্চে নবান্নের একটি বৈঠকে বলা হয়েছিল, গ্রামে এবং শহরে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করা হবে, যাঁরা প্রতি বাড়িতে ঘুরে জীবাণু নিয়ন্ত্রণের কাজও করবেন। রাজ্যের ৬০টি সরকারি এবং পুর হাসপাতালে ডেঙ্গি পরীক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে, মশার লার্ভা যাতে না জন্মায় তার জন্য খাল সংস্কার করা হবে, বর্ষার আগে বন্ধ কারখানা চত্বর, সরকারি দফতর, বাস ডিপো, আবর্জনা স্তূপ প্রভৃতি জায়গা পরিষ্কার এবং সেগুলিতে নজরদারি করা হবে ইত্যাদি। সিদ্ধান্তগুলি ইতিবাচক। কিন্তু ডেঙ্গির মতো বিপজ্জনক রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ তখনই মেলে, যখন সর্ব স্তরের মধ্যে সমন্বয়ের কাজটি সুসংগঠিত হয়। প্রতি বছরই বিভিন্ন বৈঠকে ডেঙ্গি দমনের জন্য এই পদক্ষেপগুলিই নানা ভাবে চর্চায় উঠে আসে। অথচ, সংক্রমণের মরসুম শুরু হলে আক্রান্তের সংখ্যায় রাশ টানা যায় না। অতএব, ধরে নেওয়া যায় যে, সমন্বয়ের কাজটিতে বড় ধরনের কোনও গোলমাল আছে। অথবা পদক্ষেপগুলি শুনতে যতটা আকর্ষণীয়, প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাতে ফাঁক থেকে যাচ্ছে। সুতরাং, এই মরসুমে ‘কী করা উচিত’-এর সঙ্গেই এ-যাবৎ কাল যা করে আসা হয়েছে, তার ত্রুটিগুলি খোঁজাও সমান প্রয়োজনীয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কায় গাঙ্গেয় বঙ্গের আবহাওয়া যে ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তাতে চিরাচরিত ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়ার মরসুমকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। এই রোগ এখন প্রায় সারা বছরের সঙ্গী। তাই সারা বছরই প্রতিরোধের কাজটি সমান গুরুত্বের সঙ্গে পালন করা উচিত। নির্দিষ্ট ভাবে পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধের কাজে প্রশিক্ষিত কর্মী-বাহিনী নিয়োগ করা প্রয়োজন। লক্ষণীয়, এই বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত দার্জিলিঙে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা রেকর্ড গড়েছে, যা যথেষ্ট চিন্তার। ডেঙ্গি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি বিবেচনায় আনা হচ্ছে কি? মশাবাহিত রোগের পরিবর্তিত চরিত্র বুঝতে যে পরিমাণ গবেষণাগার দরকার, যত জন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা দরকার, সেই কাজই বা কত দূর অগ্রসর হয়েছে? সংক্রমণ প্রতিরোধের কাজটি যেন নিশ্ছিদ্র হয়, সেই দিকে সরকারকে সর্বাগ্রে নজর দিতে হবে। অন্যথায়, প্রতি বর্ষার আগে পরিত্যক্ত গাড়ি, চায়ের কাপ, ডাবের খোলার গল্প শুনিয়ে মশাকে থামানো যাবে না।

Environment Pollution

গুরুত্বহীন

ভোটের বাজারে পরিবেশসংক্রান্ত উদ্বেগগুলি কি নিতান্তই অপাঙ্‌ক্তেয়? নির্বাচনী প্রস্তুতি-অন্তে দেখা গেল, পরিবেশের খাতায় পড়ে রয়েছে বিরাট শূন্য। শুধু এই নির্বাচন নয়, প্রতি নির্বাচনের পূর্বে এই রাজ্যে রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক কোন্দল, ক্ষমতা দখলের উৎকট আগ্রাসন, মারামারি, প্রাণহানি যত গুরুত্ব পায়, তার কণামাত্র জোটে না পরিবেশ সুরক্ষা এবং জনস্বাস্থ্য নিরাপদ রাখার সুসংহত পরিকল্পনা রূপায়ণে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন এবং গ্রামবাসীদের ‘ভাল থাকা’ নিশ্চিত করার প্রাথমিক দায়িত্ব স্থানীয় প্রশাসনেরই বহন করার কথা। তাই পরিবেশ বিষয়ে এই সম্পূর্ণ অবজ্ঞা ও অবহেলা বিস্ময়কর, আতঙ্কজনক।

উন্নয়নের সংজ্ঞা শুধুই রাস্তা, বাঁধ, পানীয় জলের মতো হাতেগোনা বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্যের সম্পর্কটি নিবিড়। তাই পরিবেশকে বাদ দিয়ে সার্বিক উন্নয়নের পরিকল্পনা বাস্তবোচিত নয়। সাম্প্রতিক তথ্য ইঙ্গিত করছে, পরিবেশের প্রতি যথেচ্ছাচার যত বাড়ছে, ততই বিপন্ন হচ্ছে দরিদ্র মানুষের জীবন ও জীবিকা। নদীখাত দখল করে অবাধে চলছে চাষবাস, বাড়িঘর নির্মাণ, ইটভাটা তৈরি। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন নদীর উপর নির্ভরশীল মানুষরা। অপরিমিত ভূগর্ভস্থ জল তুলে নেওয়ার ফলে পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ছে আর্সেনিক দূষণের পরিমাণ। সমস্যা আরও আছে। ২০২২ সাল অবধি বাংলার ৪১৪৬১টি গ্রামের মধ্যে মাত্র ১১৯টিতে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা রয়েছে। তরল বর্জ্যের ক্ষেত্রে চিত্রটি আরও করুণ। জঞ্জাল জমে থাকা, বেআইনি এবং অপরিকল্পিত নির্মাণ শহরের মতো গ্রামাঞ্চলেও মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যধিক বৃদ্ধি করেছে। প্রতি বছর উত্তর ২৪ পরগনায় ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্ত তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অথচ, নির্বাচনের আগে শাসক-বিরোধী পারস্পরিক কুৎসা যত চলে, এই সমস্যাগুলি নিয়ে তত আলোড়ন দেখা যায় না। যেমন, পাথর খাদান, ফসলের গোড়া পোড়ানো, বাঁধ-রাস্তা নির্মাণের নামে নির্বিচারে গাছ কেটে ফেলার মতো পরিবেশ-বিরোধী কাজ চলতে থাকে, বিরোধী রাজনীতিও গা করে না, সাধারণ মানুষও নয়।

প্লাস্টিক দূষণ নিয়ে সচেতনতার অভাবও বড় সমস্যা। নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের ব্যবহার রোধে তৃণমূল স্তর থেকে সচেতনতা গড়ে তোলার কাজ কি আদৌ অগ্রসর হয়েছে? বহু ক্ষেত্রে শহরের দূষণকারী বর্জ্য জমা করার জন্য গ্রামাঞ্চলকে বেছে নেওয়া হয়। কলুষিত হয় গ্রামের মাটি, জল, বাতাস। এই প্রবল দূষণ ঠেকাতে কী ব্যবস্থা করেছে স্থানীয় প্রশাসন? তথ্য বলছে, জলবায়ুর নিরিখে ভারতের সবচেয়ে বিপজ্জনক অঞ্চলগুলির মধ্যে চতুর্থ স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এ রাজ্যের উপকূলীয় জেলাগুলি, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং উত্তরবঙ্গ বিপন্নতার নিরিখে সর্বাগ্রগণ্য। এর পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে পরিবেশের প্রসঙ্গটি আলোচনা এবং তাকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখার প্রয়োজন বুঝতে অসুবিধা হয় না। অথচ, সাম্প্রতিক নির্বাচনেও শাসক দল তার পরিচিত উদাসীনতা বজায় রাখল, বিরোধীরাও তাকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করে তুললেন না। বস্তুত এ রাজ্যে সর্ব স্তরে পরিবেশ বিষয়টি যে কত গুরুত্বহীন, নির্বাচনের প্রচারপর্ব তা বুঝিয়ে দিল আরও এক বার। তবে কিনা, অন্ধ হলেও প্রলয় বন্ধ থাকে না।

West Bengal Panchayat Election 2023 হিংসাপ্রমত্ত

একটি মৃতদেহ ঘিরে কান্নায় ভেঙে পড়া স্বজনবান্ধব। এক নারীর আকুল কান্না। রক্তাক্ত একটি মুখ। এক আগ্নেয় অস্ত্রধারীর আস্ফালন।— পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরের সকালে সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় ভোটপর্বের কয়েকটি ছবি। এই রাজ্যে গণতন্ত্রের চালচিত্র। ভয়ঙ্কর, কিন্তু ভয়ঙ্কর সত্য। এই সত্যে শাসকদের প্রবল অরুচি। রাজ্যের প্রবীণ মন্ত্রী সুগম্ভীর বাণী বিতরণ করেছেন: কিছু বিচ্ছিন্ন অশান্তিকে বড় করে দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি নষ্ট করা হচ্ছে। অর্থাৎ, শান্তিপূর্ণ, নিরুপদ্রব, সুশৃঙ্খল ভোটের লাইন দেখালেই সেই ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হত। সেই উজ্জ্বল মূর্তির আড়ালে ওই ভয়ঙ্কর সত্যের চিত্রগুলিকে গোপন করলে যে প্রগাঢ়তম মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, শাসকরা সেই মিথ্যাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তার কারণ, সত্য তাঁদের পক্ষে নেই। সত্য এই যে, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী হিংসার পরম্পরাটি এই জমানায় এক চরম আকার ধারণ করেছে। এ বারের পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে ভোটের দিন অবধি সেই হিংস্র রাজনীতি নিরবচ্ছিন্ন প্রমত্ততায় গণতন্ত্রের কাঠামোয় প্রবল আঘাত চালিয়ে গিয়েছে। ভোট মিটলেও সেই তাণ্ডবের অবসান হবে, রক্তস্রোত এবং প্রাণহানি থামবে, এমন কোনও ভরসা নাগরিকের নেই, কারণ এই আদিগন্ত অরাজকতায় ভরসার কিছুমাত্র কারণ নেই।

শনিবার সারা দিন রাজ্যের বহু অঞ্চলে যে তাণ্ডব দেখা গেল, তা এক অর্থে চূড়ান্ত অরাজকতার বিজ্ঞাপন। রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের উপর কেবল বিরোধী দলের নয়, বৃহত্তর সমাজের আস্থা কোন তলানিতে ঠেকেছে, সেই প্রসঙ্গ বহুচর্চিত। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে গত এক মাস ধরে এত টানাপড়েন। অথচ ভোটের দিন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই বাহিনীকে কার্যত খুঁজেই পাওয়া গেল না! কেন এমনটা ঘটল, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্তাদের মধ্যে রকমারি চিঠি চালাচালির সংবাদ জেনে নাগরিকরা ধন্য হলেন, ঠিক যেমন তাঁদের চমৎকৃত করল এই বিষয়ে রাজ্যের শাসক ও কেন্দ্রের শাসকদের সওয়াল-জবাব। বুথের পর বুথে নাগরিকরা, এবং বিভিন্ন দলের— গুন্ডাবাহিনী নয়— যথার্থ ভোটকর্মীরা আক্রান্ত অথবা সন্ত্রস্ত হয়ে নিরাপত্তারক্ষীদের সাহায্য চেয়ে বিফল হলেন, অথবা তাঁদের দেখাই পেলেন না। এবং, গোটা নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব হাতে নিয়ে যিনি পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণার পূর্বলগ্নে আসন গ্রহণ করেছিলেন, সেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনার তাঁর এক মাসের বিচিত্র আচরণের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে দিনের শেষে অম্লানবদনে জানিয়ে দিলেন, তাঁর কাজ কেবলমাত্র (ভোটের) ‘ব্যবস্থা করা’, আর ‘কে কাকে গুলি করে দেবে, কাকে মেরে দেবে’ সে-কথা কেউ বলতে পারে না। ভরসা? এর পরেও?

রাজনীতির ময়দান থেকে সামাজিক সংলাপ ও তরজার পরিসর অবধি সর্বত্র এই হিংস্রতার দায়ভাগ নিয়ে নিরন্তর বিতণ্ডা চলেছে। শনিবারের ঘটনাবলিতেও কোথায় কোন দলের লোকেরা কতটা উপদ্রব করেছে তা নিয়ে শোরগোলের বিরাম নেই। বিশৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে রাজ্যের প্রশাসনে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ চাইবার প্রাচীন আওয়াজ তুলতে বিরোধীদের একাংশ যথারীতি তৎপর, শাসক দল ছাপ্পা ভোট দিলে ব্যালট বাক্স জলে (প্রয়োজনে নর্দমার জলে) ফেলে দেওয়ার আহ্বান জানাতেও তাঁরা পিছপা নন। গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বা দায়িত্বজ্ঞানের অসামান্য নমুনা বটে! কিন্তু সে-সবই গৌণ। মুখ্য প্রশ্ন একটাই: ভোট মানেই হিংসার উন্মত্ত অনুশীলন— গোটা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই এই বাস্তব কেন এমন ভাবে কায়েম হল? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায় রাজ্যের শাসকদের, কারণ দীর্ঘ বারো বছর তাঁরাই ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত। তাঁদের উদ্দেশে রাজ্যের নাগরিকদের একটাই দাবি: ছেঁদো কথা রাখুন, পশ্চিমবঙ্গে শেষ হোক দুঃশাসনের পালা। এই কুৎসিত তাণ্ডব নাগরিক সমাজের সহ্যের মাত্রা অতিক্রম করে গিয়েছে।

Digital Personal Data Protection Bill সুরক্ষার আড়ালে

বহু টালবাহানার পরে অবশেষে ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন বিল বা ব্যক্তিগত তথ্যসুরক্ষা বিল-কে ছাড়পত্র দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। সংসদে আসন্ন বাদল অধিবেশনে বিলটি পেশ হওয়ার কথা। বিলটি আইনে পরিণত হলে অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিশেষত, ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলির সঙ্গে, যাদের 'জেনারেল ডেটা প্রোটেকশন রুলস' বিশ্বের অন্যতম নিশ্ছিদ্র ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষাব্যবস্থা হিসাবে খ্যাত। গত বছর নভেম্বরে বিলের একটি খসড়া সংসদে পেশ করা হয়েছিল। তারই কিছু অদলবদল করে বর্তমানে সেটি সংসদে পেশ করা হচ্ছে। কিন্তু বিলের কিছু বিতর্কিত অংশ এখনও থেকে যাওয়ার ফলে বিভিন্ন মহলে বাড়ছে উদ্বেগ।

সবচেয়ে বেশি বিতর্ক রয়েছে এই বিলের কিছু ছাড় নিয়ে। রিপোর্ট অনুযায়ী, সরকারের অধিকার রয়েছে তথ্য ফাঁসের মতো ঘটনার ক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তা, বিদেশি সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক কিংবা জনসাধারণের শৃঙ্খলা বজায়ের স্বার্থে তার কোনও সংস্থাকে এর আওতার বাইরে রাখার। কোনও আইন তখনই গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করতে পারে, যদি সে ক্ষেত্রে কোনও বৈধ উদ্দেশ্য থাকে। শুধু তা-ই নয়, সেই উদ্দেশ্যের কোনও যুক্তিসঙ্গত যোগসূত্রও থাকতে হবে। এবং এমন পদক্ষেপ সংশ্লিষ্ট অধিকার প্রাপককে প্রভাবিত করবে না। আশঙ্কা, নিতান্ত ঠুনকো অজুহাতেই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন কোনও বিভাগ তথ্য নিরাপত্তা আইনের বিধিনিষেধ এড়িয়ে যেতে পারবে 'জাতীয় স্বার্থ' রক্ষার্থে। অন্য দিকে, প্রয়োজনীয়তা ফুরোলেও উড়িয়ে না দিয়ে 'জাতীয় সুরক্ষা'-র স্বার্থে তথ্যের মালিকের অনুমতি ছাড়াই কোনও তথ্য সরকারের কাছে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংগৃহীত রাখার কথাও রয়েছে বিল-এ। এ ক্ষেত্রেও সরকারের হাতে সুযোগ থাকছে নিজেদের স্বার্থে এই তথ্য ব্যবহার করার। তা ছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকারের ডেটা প্রোটেকশন বোর্ডের সদস্যদের নিয়োগের বিষয়টিও নিরপেক্ষ না হওয়ারই সম্ভাবনা প্রবল। প্রসঙ্গত, একবিংশ শতকে যে পরিমাণ 'ডেটা' বা তথ্য ইতিমধ্যেই সংগৃহীত রয়েছে সরকারের কাছে, তা রক্ষা করার সামর্থ্য কি তাদের আছে? অভিজ্ঞতা তা বলে না। গত কয়েক বছরে বেশ কিছু তথ্য ফাঁসের ঘটনা স্মরণীয়, যার সাম্প্রতিকতম কো-উইন অ্যাপে একশো কোটির বেশি টিকাগ্রহণকারীর ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁসের অভিযোগ। এই ধরনের ঘটনা দেশের ডিজিটাল পরিকাঠামোর ধারাবাহিক দুর্বলতারই ইঙ্গিতবাহী।

ছ'বছর আগে সংবিধানের নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তার অধিকারকে একটি মৌলিক অধিকার হিসাবে গণ্য করার রায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট। অথচ, তা লঙ্ঘন করার প্রবণতা বারে বারেই দেখা গিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের। নাগরিকের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করার এত আগ্রহ কেন সরকারের? উদ্দেশ্য কি একটি নজরদারি রাষ্ট্র গড়ে তোলা, যেখানে নাগরিকের প্রতিটি মুহূর্তের খবর রাষ্ট্রের অতন্দ্র নজরদারির অধীনে থাকবে? কিন্তু এমন ব্যবস্থা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। এক দিকে শাসক দলের হাতে লাগামহীন ক্ষমতা, আর অন্য দিকে বিরোধীদের স্বর দমন, নাগরিক পরিসর খণ্ডন— গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে তা দুঃসংবাদ। এই পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত পরিসরে নজরদারির সম্ভাব্য বিপদটি নাগরিকের মাথায় রাখা জরুরি।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Uniform Civil Code সবার জন্য সমান ‘সুবিধা’?

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি জানিয়েছেন, এক দেশে দু’টি আইন চলতে পারে না। দেশের সকল নাগরিককে একই পরিবারের সদস্যের মতো সমান সুবিধা দিতেই তিনি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চাইছেন। এই প্রসঙ্গে তাৎক্ষণিক তিন তালাক রদ আইনের কথাও বলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচার শুনে মনে হয়, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি শুধু মুসলিম মেয়েদের জন্যই দরকার। ২০২২ সালের এপ্রিলে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি মুসলিম মহিলাদের জন্য, কারণ তাঁরা তাঁদের স্বামীর তিনটে বিয়ে আটকাতে চান।

এ দেশে হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ (যারা হিন্দু সিভিল কোড আইনের আওতায়) ছাড়াও পারিবারিক আইনের আওতায় খ্রিস্টান, পার্সি যেমন রয়েছে, তেমনই বহু জনজাতিও রয়েছে। তবে মুসলিম পারিবারিক আইনের সংস্কার চেয়ে দেশে বেশ কিছু সংগঠন আন্দোলন করছে। তাদের দাবি, পারিবারিক আইনে লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে হবে। সপ্তম শতাব্দীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে যে আইন জরুরি ছিল, এ যুগে তার সংস্কার দরকার, সেটা বুঝেছে বিশ্বের বহু মুসলিম, বা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। ১৯৪৬ সালে মিশরে ‘ল অব টেস্টামেন্টারি ডিসপোজ়িশন’ প্রবর্তন করা হল, উত্তরাধিকারে মেয়েদের আরও সুবিধা দান করে। এই আইনের বিধান ১৯৫৩ সালে সিরিয়ায়, ১৯৫৭ সালে টিউনিজ়িয়ায় এবং ১৯৫৮ সালে মরক্কোতে গৃহীত হয়েছে। ১৯৬১ সালে পাকিস্তানে মুসলিম পারিবারিক আইন সংস্কার হয়েছে। কিন্তু ভারতে এই আইন সংস্কারের দাবি তুললেই ‘ধর্মের নামে রাজনীতিকরণ’-এর ফাঁদে আটকে যাচ্ছে।

মুসলিম ব্যক্তিগত আইন প্রণয়নের ইতিহাসের দিকে তাকালেই টের পাওয়া যায়, আইন তৈরি হয় বাস্তব সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই। কাজী আবদুল ওদুদ কোরানের অনুবাদে নারী-সম্পর্কিত বিধিনিয়ম সম্বলিত ‘সূরা-আন-নিসা’ অংশটি ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, ওহোদের যুদ্ধে সাতশো মুসলমান যোদ্ধার মধ্যে সত্তর জন নিহত হলে নারী আর অভিভাবকহীন ছেলে-মেয়ে একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। এই সূরায় বিবাহের বিধিনিষেধ সম্বন্ধে, আর নারীদের ও অনাথদের সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, বিধবা বিবাহ, সম্পত্তির অধিকার সম্বলিত মুসলিম পারিবারিক আইন সবটাই গঠিত বাস্তবের অনুষঙ্গে। দৃষ্টান্ত মজুত। কিন্তু এ দেশের মুসলিম মৌলবাদ অনড়। তারা শাহবানুর আন্দোলনের শরিক হয় না। তাৎক্ষণিক তিন তালাকের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন যে পাঁচ মহিলা, তাঁদের সমস্যা মুসলিমদেরই সামাজিক সমস্যা। তবু তা রদ করার জন্য মুসলিম-সমাজ এগিয়ে এল না। এই রক্ষণশীলতা মুসলিম মহিলাদের দাবি পূরণের প্রধান অন্তরায়। তবু রাজনৈতিক দলগুলো ভোট-বৈতরণি পেরোতে রক্ষণশীল গোষ্ঠীগুলিকেই হাওয়া দিয়ে চলেছে। মুসলিম মৌলবাদের অটল মনোভাব এ দেশের মুসলিমদের আরও বিপদের মুখে ফেলছে। সম্প্রদায়ের ভিতর থেকেই পারিবারিক আইন সংস্কারের জোরালো দাবি উঠলে মোদী সরকার মুসলিম মহিলাদের আইন সংস্কারের প্রয়োজনকে সামনে রেখে উস্কানিমূলক কথা বলতে পারত না।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করতে বাধা দিচ্ছে মুসলিম নেতাদের বিরোধিতা, এমন বার্তা সংখ্যাগুরুদের মজ্জায়-মননে প্রবেশ করাতে পারলে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। খ্রিস্টান, পার্সি, জনজাতি, এমনকি সংখ্যাগুরু হিন্দু সকলেই কি চাইছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি? সবার এক আইন— ভাবলে ভাল লাগে। কিন্তু কী সেই আইন? মনুসংহিতা যাদের জীবনের সঙ্গী, তারা দেশকে কোন আইন উপহার দেবে? তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে রামমোহন, বিদ্যাসাগরকে। হিন্দু কোড বিল পাস করাতে হয়েছে হিন্দু মৌলবাদের বিরুদ্ধে গিয়ে। যাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য মন্দির আর হিন্দু ধর্মের উৎসব, তাদের হাতে তৈরি হবে লিঙ্গ সাম্যের আইন?

বিজেপি সরকার ও তার দল ধারাবাহিক ভাবে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়েছে। ভারতের মানুষ শুনল, মুসলমানরা নমাজ পড়ে কোলাকুলি করে, ওতেই করোনা ছড়িয়েছে। শুনল, ভালবাসাও 'জেহাদ'। মুসলিম ছেলে হিন্দু মেয়েকে ভালবাসতে পারবে না। ২০২২ সালে বিজেপি পরিচালিত কর্নাটকের মন্দিরের সামনে বহু দিন ধরে ব্যবসা-করা মুসলিম ফল ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। দরিদ্র মুসলমানকে খুন হতে হয়েছে 'জয় শ্রীরাম' না বলার জন্য। গরুর মাংস আছে ফ্রিজে, সন্দেহে মুসলমান যুবাকে মেরে ফেলা হয়েছে। তাৎক্ষণিক তিন তালাক রদ করার নামে ফৌজদারি আইন তৈরি হয়েছে। পুরুষটিকে জেলে পাঠিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে, কিন্তু তার স্ত্রীর সামাজিক, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কথা ভাবা হয়নি। ১৫ অগস্ট ২০২২, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন ভাষণে নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলছিলেন, একই দিনে গুজরাতের বিলকিস বানোর ১১ জন ধর্ষক মুক্তি পায়। আর হিন্দুত্ববাদী দল তাদের ফুল-মালায় বরণ করে নেয়। এই কি নারীর ক্ষমতায়ন? এই কি সকলের জন্য এক উদার বিধি? বিজেপি নেতা ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে যন্তর মন্তরে অবস্থানরত মহিলা কুস্তিগিরদের কথা কি আমরা তা হলে ভুলে যাব?

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Uniform Civil Code অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পিছনে রাজনৈতিক যুক্তি, নির্বাচনী রণকৌশল বিলক্ষণ আছে, কিন্তু তার নিজস্ব বাস্তব দর্শন এবং যুক্তিও আছে। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড থেকে একটা কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে— গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক দেশের কর্তৃত্ব হাতে নিলেও তারা তাদের ধর্মীয় পরিচয় ত্যাগ করেনি। রাষ্ট্রীয় পরিসরে হিন্দুত্ববাদী আচারের সংখ্যা ও প্রাবল্য বেড়েছে। বিরোধী পক্ষের মোটামুটি সবাই, এবং দেশ-বিদেশের এক বড় অংশের মানুষজন এটা মেনে নিচ্ছেন না। এ রকম একটা পরিস্থিতিতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সংক্রান্ত আলোচনা, বিশেষ করে তাকে আইনানুগ করার প্রয়াস, নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

অবিভক্ত দেওয়ানি বিধির মূল বক্তব্য (যদি তেমনটি সরকার বাহাদুর যথার্থ বলে ভাবেন) হবে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন আইনি অনুশাসন উপেক্ষা করে একই আইনের আওতায় সব নাগরিককে নিয়ে আসা। এই প্রক্রিয়া বা নীতি এই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ যে, ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক দেশ, অন্তত খাতায়-কলমে এখনও তা-ই। বিধিটি কী ভাবে লিখিত হবে, সেখানে কী লেখা থাকবে বা থাকবে না, কেমন ভাবে সর্বসাধারণের জন্য 'অভিন্ন' করা হবে দেওয়ানি বিধি, সেগুলো পরের কথা। দেশের আইন সব নাগরিকের জন্য সমান। যে কোনও ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে সচেতন ভাবেই দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক এবং ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের সবচেয়ে বড় মুকুটটিকে কিছুতেই ভূলুণ্ঠিত করা উচিত নয়। এই প্রশ্নটি নিয়ে অযথা বিবাদ-বিতর্ক বাঞ্ছনীয় নয়।

সব ধর্মই ব্যক্তিগত পরিসরে ঈশ্বরসাধনার ব্যাপার, রাষ্ট্রতন্ত্রের ব্যাপার নয়। যেমন সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অনুশাসনের কাছাকাছি থেকে ভোটের ব্যবসা অত্যন্ত নিন্দনীয়, তেমনই সংখ্যাগুরুর ধর্মীয় অস্তিত্বকে সর্বশক্তিমান ও মহান আখ্যা দিয়ে অন্য ধর্মের নাগরিকদের যন্ত্রণা দেওয়া ঘোর অন্যায়। আর যে-হেতু সংখ্যাগুরুর দায়িত্ব অনেক বেশি হওয়া উচিত, তাই সব সময় সংখ্যালঘু ধর্মজাত সমালোচনাযোগ্য অনুশাসন বাদ দিয়ে এক বিধি তৈরি করা যেন পিছনের দরজা দিয়ে সংখ্যাগুরুর ধর্মীয় কর্তৃত্বকে নিরঙ্কুশ করার চেষ্টা না হয়। সবই আমাদের মনে রাখা উচিত। কোনও সভ্য, সুচেতন দেশে ধর্ম

রাষ্ট্রতন্ত্রকে গিলে ফেলে না। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ এবং অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বলেই গর্বিত, এই ধারণাটির কোনও বিকল্প নেই।

এই প্রসঙ্গে এ বছর বঙ্গভঙ্গ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে এ ব্যাপারে শ্যামাপ্রসাদ, জওহরলাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধী— সবার মন্তব্য আবার নতুন করে আলোচিত হচ্ছে। যে-হেতু বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং ধর্ম রাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়ে আবর্তিত, তাই বঙ্গভঙ্গকেও অভিজ্ঞতা এবং নতুন দৃষ্টিতে দেখা উচিত। শ্যামাপ্রসাদ এবং নেহরুর মতাদর্শ দুই মেরুতে অবস্থিত। তবু বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে শ্যামাপ্রসাদের বক্তব্য নেহরু এবং পটেল মেনে নিয়েছিলেন। কারণ দু'পক্ষেরই দূরদৃষ্টি ছিল প্রখর। এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে বাংলা ভাগের জন্য যতই ব্রিটিশদের গালমন্দ করি, আইনসভায় পশ্চিমবঙ্গের সদস্যরা এই প্রস্তাবের সপক্ষে ৫৮টি ভোট দেন, বিপক্ষে ২১টি। পূর্ববঙ্গের সদস্যদের ক্ষেত্রে এর ঠিক উল্টো হয়। তাই বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের জন্যই বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল। তা হলে ব্রিটিশদের সঙ্গে আমাদেরও ভর্ৎসনা প্রাপ্য। শ্যামাপ্রসাদের যুক্তিটি নেহরু মেনে নিয়েছিলেন, কারণ তাঁর যুক্তির মধ্যে এমন কিছু ছিল যা ভবিষ্যতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াত— তিনি বলার চেষ্টা করেন যে, যদি অবিভক্ত বাংলায় হিন্দুদের সংখ্যা বেশ খানিকটা কম হয় তা হলে অবিভক্ত বাংলা এক দিন ধর্মীয় পথ ধরে হাঁটতে শুরু করবে। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ তকমা যদি আইনগত ভাবে না থাকে তা হলে সংখ্যালঘুরা বিপদে পড়বে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৮৮ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ইসলামিক প্রজাতন্ত্র হয়ে যায়। অথচ পাকিস্তান হওয়া সত্ত্বেও ভারত ধর্মনিরপেক্ষ।

শ্যামাপ্রসাদের যুক্তিটি নেহরু এবং অবশ্যই পটেল মেনে নিয়েছিলেন। যে কারণে সেই সময় হিন্দুমহাসভার প্রবক্তা বঙ্গদেশে হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় শাসনের আওতা থেকে বাঁচাতে সচেষ্ট ছিলেন। সেই কারণেই নেহরু ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ ভারত সহস্র সমস্যা সত্ত্বেও সংখ্যালঘুগোষ্ঠীকে স্বস্তি দিয়েছে, শান্তি দিয়েছে এত কাল, তাঁরা নিজেদের অরক্ষিত ভাবেননি। কিন্তু আজ সময় পাল্টাচ্ছে।

কার মনে কী ছিল বা আছে বোঝা শক্ত। আমরা তাঁদের প্রকাশিত মন্তব্য, বক্তব্য, যুক্তি এ সব দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি তিনি কী বলতে চাইছেন। নেহরু এবং শ্যামাপ্রসাদ দু'জনেই অশিক্ষিত এবং কুশিক্ষিত যুক্তির শিকার হয়েছেন। তাঁরা নিজেদের মতো করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। নেহরু এই বিরাট দেশটার রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক ভারসাম্য রাখতে চেয়েছিলেন সংখ্যালঘুদের আশ্বস্ত করে। অবিভক্ত বাংলায় সংখ্যালঘু সমানাধিকার পাবে না, শ্যামাপ্রসাদ সেই আশঙ্কাকে চিহ্নিত করেছিলেন। অর্থাৎ ধর্মের অনুশাসন ভাল বা খারাপ যা-ই হোক না কেন, তাকে রাষ্ট্রতন্ত্রের থেকে শত হস্তে দূরে রাখাটাই কাম্য। ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার এটিই একমাত্র এবং মৌলিক শর্ত।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Flood In Northern India বিপর্যয়

বছরভর তীব্র দূষণে ধুঁকতে থাকা ক্ষীণকায়া যমুনাকে দেখে কি আন্দাজ করা যেত যে, সে নদী দিল্লিকে এমন ভাসিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে? গত পঁয়তাল্লিশ বছরের রেকর্ড ছাপিয়ে যমুনার জল সম্প্রতি বিপদসীমার তিন মিটার উপর দিয়ে বয়েছে। সৌজন্যে, দিল্লির সাম্প্রতিক বর্ষা। রাজপথের বিভিন্ন স্থানে নৌকা চলেছে, জল ছুঁয়েছে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়ালের বাসভবন, সুপ্রিম কোর্টের দোরগোড়া। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে, চাকরিজীবীদের বাড়ি থেকে কাজের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। দিল্লির ক্ষেত্রে এ-হেন বন্যাচিত্র বিরল হলেও উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষেত্রে তেমনটা নয়। প্রতি বছর উত্তরাখণ্ড এবং হিমাচলের বিস্তীর্ণ পাহাড়ি এলাকায় বর্ষার শুরুতে প্রবল বৃষ্টি, হড়পা বান এবং বন্যায় তোলপাড় হওয়ার ঘটনা এখন আর বিস্মিত করে না। এ বছরও ব্যতিক্রম নয়। শুধুমাত্র হিমাচলপ্রদেশেই এক সপ্তাহের মধ্যে প্রাণহানি হয়েছে প্রায় একশো জনের। স্বাভাবিকের তুলনায় ২২৬ শতাংশ অধিক বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে জাতীয় সড়ক, সেতু।

বর্ষায় পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টি-বিপর্যয় নতুন নয়। ধস নামা, হড়পা বানে গ্রাম ভেসে যাওয়ার নিদর্শনও বহু। সেই বিপদ মাথায় নিয়েই বাসিন্দারা দিনাতিপাত করেন, প্রকৃতির মর্জি বুঝে যাপনের ধারায় বদল আনেন। কিন্তু গত কয়েক বছরের বর্ষায় বিশেষত হিমাচল ও উত্তরাখণ্ডে যে আবহাওয়া দেখা গিয়েছে, তা যেন যাবতীয় অনুমান, হিসাবকে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। এত ঘন ঘন এই মাপের বিপর্যয় অতীতে দেখা যায়নি। হিমাচলের বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত তথ্য অনুসারে, ২০১৭ থেকে ২০২২-এর সময়কালে প্রায় দু'হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন শুধুমাত্র বৃষ্টি-বিপর্যয়ের কারণে। কিন্তু এই বিপর্যয় কি শুধুই প্রাকৃতিক? হিমালয় বয়সে নবীন এবং চরিত্রগত ভাবে ভঙ্গুর। অথচ, মাটির সেই বৈশিষ্ট্যকে কার্যত উপেক্ষা করে এই অঞ্চলে যে বেপরোয়া ভাবে পর্যটনের প্রসার ঘটানো হয়েছে, চওড়া রাস্তা নির্মিত হয়েছে, নদীর প্লাবনভূমিকে অগ্রাহ্য করে তার ধার ঘেঁষে বহুতল হোটেল গড়ে উঠেছে, তাতে এই ক্ষয়ক্ষতি কি খুব অপ্রত্যাশিত ছিল? নিঃসন্দেহে নির্বিচারে পাহাড় কেটে, মাটিকে ধরে রাখা বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমি ধ্বংস করে 'উন্নয়ন'-এর জোয়ারের ধাক্কা হড়পা বানের তুলনায় কম কিছু নয়। সেই জোয়ারে আক্ষরিক অর্থে 'ভাসছে' এই দুই পাহাড়ি রাজ্য।

দিল্লির মতো অত্যাধুনিক শহর প্লাবিত হওয়ার অন্যতম কারণও সেটাই। অপরিকল্পিত নগরায়ণের তোড়ে সেখানে প্রাকৃতিক নিকাশি নালাগুলির হাল শোচনীয়। এবং এ ক্ষেত্রে দিল্লি, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, কলকাতা— তফাত নেই বিশেষ। সাম্প্রতিক অতীতে হায়দরাবাদ বা বেঙ্গালুরুর বন্যার কারণ হিসাবেও উঠে এসেছিল জল নিকাশের পথগুলি রুদ্ধ করে নগরের বিস্তারকে জবরদস্তি সে দিকে ঠেলে দেওয়া। ফলে, অতিবৃষ্টিতে জমা জল বেরোনোর সহজ পথ না পেয়ে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। দিল্লিতে পলি পড়ে যমুনার খাত প্রায় ভরাট হয়ে এসেছে, এবং সেই পলি সরানোয় সরকারি উদাসীনতা লক্ষণীয়। জলস্তর বিপদসীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার কারণটি সহজবোধ্য। কলকাতার সৌভাগ্য, সাম্প্রতিক কালে তাকে অতিবর্ষণের সম্মুখীন হতে হয়নি। হলে, শহরের গামলার মতো আকৃতি, অনিয়মের নগরায়ণ এবং বুজে আসা

Poverty সংখ্যার দারিদ্র

শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জীবনযাত্রার মান, এই তিনটির নিরিখে বিচার করে নীতি আয়োগের দাবি— ভারতে দারিদ্র কমেছে। নীতি আয়োগের বহুমাত্রিক দারিদ্র সূচক অনুসারে, ২০১৯-২১ সালে ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় পনেরো শতাংশ দরিদ্র, যা ২০১৫-১৬ সালে ছিল প্রায় পঁচিশ শতাংশ। সাড়ে তেরো কোটি মানুষের দারিদ্রমুক্তি ঘটেছে, এমন সুখবরে আহ্লাদিত হওয়ারই কথা। সমস্যা হল, নানা দিক থেকে উন্নয়নের বিচিত্র পরিসংখ্যান অনবরত ছুটে আসে নাগরিকের দিকে। তৈরি হয় বিভ্রান্তি। যেমন, যে বারোটি মাপকাঠিতে দারিদ্রের ওঠা-নামা বিচার করছে নীতি আয়োগের ‘বহুমাত্রিক দারিদ্র সূচক’, তার প্রথমেই রয়েছে অপুষ্টি। শিশু-অপুষ্টি কমেছে, এমনই দাবি নীতি আয়োগের। কিন্তু যে সমীক্ষার ভিত্তিতে এই সূচক রচিত, সেই পঞ্চম জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা (২০১৯-২১) দেখিয়েছিল, ভারতে শিশু-অপুষ্টির চিত্র যথেষ্ট উদ্বেগজনক। পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের মধ্যে পঁয়ত্রিশ শতাংশেরই অপুষ্টির কারণে উচ্চতায় ঘাটতি রয়েছে (স্টান্টেড)। হতে পারে তা পূর্বের থেকে (২০১৫-১৬) সামান্য কম (তিন শতাংশ বিন্দু), কিন্তু তাতে কি আশ্বস্ত হওয়া চলে? আন্তর্জাতিক ক্ষুধা সূচকও (২০২২) দাবি করেছিল যে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে অপুষ্টির নিরিখে ভারতের পিছনে রয়েছে কেবল আফগানিস্তান। ভারত সরকার সেই তথ্যের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছিলেন যে, সেই তথ্যের সঙ্গে সরকারি তথ্যের খুব বেশি গরমিল নেই। আরও মনে রাখতে হবে, পঞ্চম জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষার বেশ কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল কোভিড অতিমারির আগে। ভারতের নিম্নবিত্তের উপরে অতিমারির ভয়াবহ প্রভাব দেখে আশা করা কঠিন যে, ২০২২ সালে ক্ষুধা ও অপুষ্টির চিত্রে উন্নতি হয়েছে।

দারিদ্রমুক্তির হাল বুঝতে যে সমীক্ষাগুলি সাহায্য করত, তার অনেক ক’টা খারিজ করেছে মোদী সরকার। যেমন, জাতীয় নমুনা সমীক্ষার (এনএসএস) উপভোক্তা ব্যয় সমীক্ষার (২০১৭-১৮) ফল সরকারি ভাবে প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু তার যে অংশটুকু প্রকাশিত হয়েছিল সংবাদমাধ্যমে, তাতে দেখা গিয়েছিল, খাদ্য-সহ নানা অত্যাবশ্যক সামগ্রীতে ব্যয়ের হার কমেছে, বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে। ব্যয়ক্ষমতায় এমন পতন দারিদ্র বাড়ার লক্ষণ, তাই বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। একই সময়ে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার নিয়োগ ও বেকারত্ব সংক্রান্ত সমীক্ষাটি দেখিয়েছিল গ্রামাঞ্চলে কর্মহীনতা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। এই দু’টি সমীক্ষার তথ্য নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু কৃষি যে অলাভজনক রয়ে গিয়েছে, এবং গ্রামীণ এলাকায় মজুরি বৃদ্ধির হারের চেয়ে দ্রুত হারে বেড়েছে খাবারের দাম, এ তথ্য অস্বীকার করা সহজ নয়। ভারতের ৭০ শতাংশ মানুষ থাকেন গ্রামে, এবং তাঁরা অধিকাংশই কৃষি-অর্থনীতি নির্ভর। অতএব তাঁদের দারিদ্র হ্রাসের সম্ভাবনা কতখানি, তা নিয়ে সংশয় থাকতে বাধ্য।

উন্নয়নের নজির বলে মানব উন্নয়নের যে সব পরিসংখ্যান পেশ করে সরকার, সেই সংখ্যাগুলির পিছনের চিত্রটিও দেখা প্রয়োজন। পানীয় জলের নল থাকলেও তা দিয়ে জল আসে কি না, বিদ্যুৎ-সংযোগ থাকলেও বিদ্যুৎ মেলে কত ক্ষণ, ডাকঘরে অ্যাকাউন্ট থাকলেও তা শূন্য অঙ্কেই রইল কি না, তার উত্তর না পেলে দারিদ্রমুক্তির প্রকৃত ছবি আঁকা যায় না। উজ্জ্বলা প্রকল্পে নাম লেখানো মহিলারাও যে কয়লা আর কাঠকুটোয় উনুন জ্বালাচ্ছেন, স্কুলে গিয়েও শিশুরা লিখতে-পড়তে শিখছে না, সে তথ্য অস্বীকার করার উপায় নেই। আরও নিবিড়, আরও পূর্ণাঙ্গ ছবি আঁকার উদ্দেশ্যেই উন্নয়নের সূচকগুলির প্রবর্তন করা হয়েছিল। আক্ষেপ, এখন সেগুলি যেন হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক আস্ফালনের অস্ত্র। তাই অবিমিশ্র উন্নতি ছাড়া (সূচক বলছে, ভারতে উন্নতি হয়েছে বারোটি মাপকাঠিতেই) আর কোনও বার্তা মেলে না।

Calcutta High Court উধাও জলাশয়

কলকাতার পরিবেশকে সুস্থ রাখতে আন্তর্জাতিক রামসার তালিকাভুক্ত পূর্ব কলকাতা জলাভূমিকে অক্ষত রাখা একান্ত প্রয়োজন— এই কথাগুলি বারংবার শোনা গিয়েছে পরিবেশ বিশেষজ্ঞ এবং সচেতন মানুষের মুখে। কিন্তু বেআইনি নির্মাণের ধাক্কায় সেই সতর্কবার্তা ভেসে গিয়েছে। সম্প্রতি সেই বেআইনি নির্মাণ রুখতে নজরদারি কমিটি গড়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। বলা হয়েছে, আগামী আট সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এই কমিটি তৈরি করবে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই গজিয়ে ওঠা অবৈধ নির্মাণগুলির বিষয়েও। পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আচমকা পরিদর্শনে এ-হেন অবৈধ নির্মাণ ধরা পড়লে তা ভেঙে ফেলতে হবে। নির্মাণকারী সেই কাজটি না করলে কমিটিই সেই দায়িত্ব নেবে, এবং সে ক্ষেত্রে খরচ দিতে হবে নির্মাতাকেই। নির্মাতার বিরুদ্ধে ফৌজদারি ব্যবস্থাও করতে হবে।

আদালতের রায় শিরোধার্য, তবুও একটি প্রশ্ন তোলা হয়তো অসঙ্গত হবে না। যেখানে জলাভূমি সংরক্ষণ আইন আছে, তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কার এবং কী ভাবে সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে তা স্পষ্ট ভাবে বলা আছে, সেখানে আরও একটি কমিটি গঠন কি পরিস্থিতিকে আদৌ পাল্টে দিতে পারবে? অভিজ্ঞতা বলে যে, পরিবেশবিদদের আন্দোলন, আদালতের নির্দেশ, জনস্বাস্থ্যের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি— সব উপেক্ষা করেই এই রাজ্যে পরিবেশ সংক্রান্ত দীর্ঘলালিত সমস্যাগুলির কোনও পরিবর্তন হয় না। নানা বিষয়ে কমিটি গঠনের উদ্যোগটুকুই শুধু হয়, সুরাহা দূর অস্‌ত্‌। জলাভূমি চুরি গোপনে সম্পন্ন করা কঠিন। সর্বসমক্ষেই সে কাজ হয়, এবং প্রশাসনও সে বিষয়ে দিব্য অবগত। কারণ, এ সংক্রান্ত যাবতীয় অভিযোগ পুলিশের কাছেই জমা পড়ে। রাজ্য পরিবেশ দফতরের অধীন নোডাল সংস্থা ‘পূর্ব কলকাতা জলাভূমি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ’-এর অভ্যন্তরীণ রিপোর্টই জানাচ্ছে, ২০০০-২০১৯ সালের মধ্যে এই এলাকায় নির্মাণের সংখ্যা লক্ষণীয় হারে বেড়েছে। বেড়েছে জলে এবং মাটিতে ভারী ধাতব পদার্থের পরিমাণও। অতর্কিত পরিদর্শনে বাড়তি লাভ হবে কি?

ইতিপূর্বে এই অঞ্চলে জলাভূমি ভরাট সংক্রান্ত একাধিক মামলায় জাতীয় পরিবেশ আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, বেআইনি নির্মাণ যাতে না হয়, সরকারকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই নির্দেশ এবং বাস্তবের মধ্যে দূরত্বটি মোছেনি। পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য আইন অনুযায়ী, পাঁচ কাঠা বা তার থেকে বড় কোনও জলাশয় বিনা অনুমতিতে ভরাট করা হলে, তাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা বাধ্যতামূলক। সেই কাজই বা কতটুকু এগিয়েছে? প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারংবার দাবি করা হয়, জলাভূমিকে বাঁচাতে সরকার বদ্ধপরিকর। ভাল কথা। কিন্তু এত দিনে যত বেআইনি নির্মাণ সেখানে হয়েছে, তার কত শতাংশ ভেঙে পূর্বাবস্থায় ফেরত নিয়ে আসা গিয়েছে, সেই সুনির্দিষ্ট তথ্য কই? প্রসঙ্গত, পূর্ব কলকাতা জলাভূমি বিনামূল্যে প্রতি দিন দৈনিক শহরের ৯১ কোটি লিটার নোংরা জল প্রাকৃতিক ভাবে পরিশোধনের কাজটি করে থাকে। এর ফলে কত কোটি টাকা সরকারের সাশ্রয় হয়, সেই হিসাবটুকুও বোধ হয় প্রশাসন আত্মস্থ করতে পারেনি। করলে, প্রচলিত ব্যবস্থাগুলিকেই কড়া হাতে কার্যকর করত। আদালতের নির্দেশে নজরদারি কমিটি গঠন করতে হত না।

Cyber Crime স্বার্থরক্ষা

খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ওল্টালে দু'এক দিন অন্তর এক বিশেষ গোত্রের সংবাদ চোখে পড়ে— অনলাইন জালিয়াতি। কেউ দুষ্কৃতীদের ওটিপি দিয়ে ঠকেছেন, কেউ কোনও লিঙ্কে ক্লিক করে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। কেউ লোভের বশে অপরাধীদের ফাঁদে পা দিয়েছেন, কেউ আবার অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে। খুঁজলে ভুক্তভোগীদের মধ্যে দু'টি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যাবে— এক, তাঁরা অনলাইন দুনিয়ার চালচলনের সঙ্গে তেমন অভ্যস্ত নন; এবং দুই, গত কয়েক বছরে ভারত যে দ্রুতগতিতে অনলাইন লেনদেনের পথে হেঁটেছে, তাতে তাঁরাও বাধ্য হয়েছেন সেই তালে তাল মেলানোর চেষ্টাতে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অনলাইন লেনদেনের এই দ্রুত অগ্রগতি ভারতীয় অর্থব্যবস্থার পক্ষে সুসংবাদ, এবং সে-বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের সাধুবাদও প্রাপ্য। কিন্তু, সেই অগ্রগতির দায় যদি প্রযুক্তি ব্যবহারে তুলনায় অদক্ষ মানুষদের উপরে বর্তায়— অভিজ্ঞতা বলছে, যাঁদের অধিকাংশই প্রবীণ নাগরিক— তা হলে বুঝতে হয়, পরিকল্পনায় ফাঁক থেকে গিয়েছে। এই ফাঁক অবশ্য বর্তমান সরকারের অভিজ্ঞান। কিছুই করা হয় না, বললে অবশ্য অনৃতভাষণ হবে। অনলাইন জালিয়াতি বিষয়ে নাগরিককে সচেতন করার জন্য জনজ্ঞাপন উদ্যোগ শুরু হয়েছে বেশ কিছু দিন হল। সেই বিজ্ঞাপনে নাগরিককে জানানো হয়, অনলাইন লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন কাজগুলি নিরাপদ, কোনগুলি বিপজ্জনক। সচেতনতা তৈরির এই উদ্যোগের গুরুত্ব খাটো করে দেখানোর প্রশ্নই নেই। কিন্তু, সেটুকুই কি যথেষ্ট? সেই উদ্যোগ সত্ত্বেও যাঁরা প্রতারিত হবেন— হয়তো নিজেদের ভুলেই— তাঁদের কি সেই ভুলের মাসুল গুনে দেওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর থাকবে না?

গ্রাহকের প্রান্ত থেকে তথ্য চুরি যাওয়ার ঘটনা যেমন ঘটে, তেমনই বিভিন্ন সংস্থার তথ্যভান্ডার থেকেও তথ্য চুরি যায়। সেই প্রবণতাও গোটা দুনিয়াতেই ক্রমবর্ধমান। সম্প্রতি একটি বৈশ্বিক সমীক্ষায় জানা গেল যে, দুনিয়ার সর্বত্রই এই ক্ষতির বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় গ্রাহকের উপরে। ভারতও ব্যতিক্রম নয়। অর্থাৎ, যে ক্ষেত্রে দোষের তিলমাত্রও গ্রাহকের নয়, সেই ক্ষেত্রেও তাঁরাই আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। যে-হেতু কোনও এক জন গ্রাহক এবং কোনও একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার কোনও তুলনা চলে না, অতএব কোনও মধ্যস্থতাকারী শক্তি না থাকলে এই দ্বন্দ্বে প্রতি বারই গ্রাহকের পরাজয় নিশ্চিত। এখানেই সরকারের ভূমিকা। সমীক্ষা বলছে, তথ্য তছরুপের প্রবণতা ঠেকাতে কৃত্রিম মেধা ও অটোমেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে— যে সংস্থাগুলি এ কাজে এই নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করছে, তাদের তথ্যচুরির ঘটনা কমেছে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে। কিন্তু, সেই প্রযুক্তির প্রয়োগ ব্যয়সাপেক্ষ, সেই কারণেই এখনও সিংহভাগ সংস্থা তা এড়িয়ে চলেছে। এ ক্ষেত্রে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করা সরকারের কর্তব্য। যে সংস্থা তথ্য তছরুপ এড়াতে সন্তোষজনক ভাবে যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না, তথ্য চুরি গেলে তার আর্থিক দায় সেই সংস্থার উপরে বর্তাবে, এমন একটি নিয়ম সিংহভাগ সংস্থাকেই দায়িত্বশীল করবে। অন্য দিকে, ব্যাঙ্ক বা ক্রেডিট কার্ডে লেনদেনের ক্ষেত্রেও বিমা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে, যেখানে জালিয়াতি হলে তার জন্য বিমার টাকা পাওয়া যাবে। বাজারব্যবস্থায় গ্রাহকের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব সরকার অস্বীকার করতে পারে না।

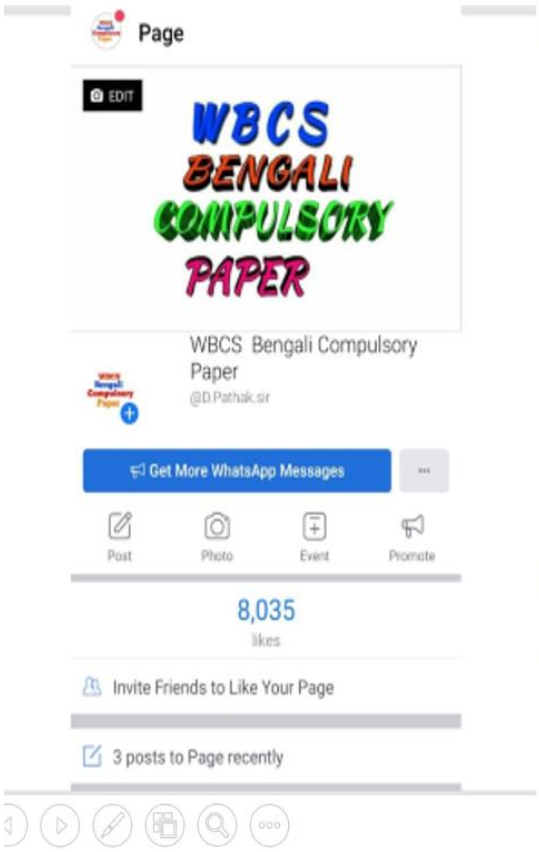

WBCS Bengali Compulsory Paper

- ❖Online class –Sunday 8am
- ❖RECORDED VIDEO
- ❖Log in id
- ❖Mock test - Monday and Friday
- ❖Live mock - সোমবার ও শুক্রবার 9.30pm
- ❖Model Answer
- ❖CLASS -200/month
- ❖WhatsApp: 8537872204

By Pathak sir

WBCS Bengali Compulsory Paper .com
https://wbcsbengalicompulsorypaper.com

নিয়মিত অনুশীলন

LIVE MOCK

**বাড়ি থেকে পরীক্ষা -*প্রশ্নপত্র দেওয়া হবে –*pdf করে লিখে পাঠাতে হবে। সপ্তাহে সোমবার ও শুক্রবার print করে খাতা দেখা হবে / খাতা দেখার পর মোডেল উত্তরপত্র দেওয়া হবে /লেখাগুলো 7047352328 নাম্বারে পাঠাতে হবে

- ❖Fees - ₹ 100 / month
- ❖WhatsApp: 8537872204

By Pathak sir